ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1375-1381
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.06W.143

ক্ষমতায়নে প্রান্তিক নারী: মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত ছোটগল্প অবলম্বনে

প্রত্যুষা দাস, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.07.2025; Accepted: 22.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The history of women's deprivation is a long-standing norm in our society and civilization. And in a society where an entire community is looked down upon as lower class, the struggle to establish the rights of women from that community was even more challenging. Yet, these women did not live lives like helpless, destitute beings. On the contrary, they fought and earned their social, political and economic rights. Mahasweta Devi successfully portrayed that struggle with detailed realism. Having spent a significant part of her life with these marginalized communities, she had the opportunity to closely observe the women of those groups, becoming a direct witness to their resilient and combative spirit. In Mahasweta Devi's short stories, we can clearly see the narrative of women's efforts to establish their socio-economic and political spheres through confident resistance. I have attempted to discuss that effort of women's empowerment in marginalized societies through a selection of Mahasweta Devi's stories.

Keywords: Marginalized women, Exploitation of women, Deprivation, Protest, Claiming rights, Women's empowerment

ক্ষমতা শব্দটি ভীষণ আপেক্ষিক। ক্ষমতা বলতে আসলে বোঝায় অধিকারের আধিপত্যকে। কালে কালে যে শ্রেণি নিজেদের অধিকারকে বুঝে নিয়ে আধিপত্যকে বিস্তৃত করে তাদের অস্তিত্বকে প্রগাঢ় করে তুলতে সক্ষম হয়েছে তারাই আর সব শ্রেণির ঊর্ধ্বে উঠে সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি সবক্ষেত্রেই ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটাতে সফল হয়েছে। এর ফলস্বরূপ তথাকথিত উচ্চবিত্ত ও অর্থাভিমানী মানুষরাই নিম্নবিত্ত এবং নিম্নবর্গ মানুষদের ওপরে আধিপত্য বিস্তার করে সমাজের উঁচু স্থানটা গ্রহণ করেছে। আর এই উচ্চস্থানাধিকারী মানুষরাই ভারতবর্ষের সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও, কোল, দুসাদ, শবর, লোধা, গঞ্জুর মত এরকম অজস্র জাতিকে ভারতবর্ষের আদি অধিবাসী হিসেবে যোগ্য সম্মান না দিয়ে তাদের করে তুলেছে লাঞ্ছনার 'আদিবাসী', যারা চিরকাল নিম্নবর্গ, অস্পৃশ্য ও ক্ষমতাহীন হয়ে অচ্ছুতের মত প্রান্তিক জীবনযাপন করে নিজের ন্যায্য অধিকারের জন্য লড়াই করে কাটিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে যুগের পর যুগ। কিন্তু প্রকৃতির এই কোল ঘেঁষে থাকা আদি মানুষগুলোর অধিকার যখন সমাজের উচ্চবিত্ত, 'সভ্য' শ্রেণি কেড়ে নিতে শুরু করল, নগরায়ণ ঘটিয়ে তাদের বাসভূমিকেও মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার নীতি নিল, মানুষের বেঁচে থাকার সামান্য উপকরণগুলো পর্যন্ত কেড়ে নিলো তখন তারা নিজেদের অধিকার ও সম্মান আদায়ের জন্য যে আমরণ লড়াইটা করেছিল তার ইতিহাস নিয়ে কেউ মাথা ঘামালোনা। কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাস বরাবরই ক্ষমতার পক্ষে সওয়াল করতে ব্যস্ত থেকেছে, এমনকি ভারতবর্ষের সাহিত্যও একটা সময়ের আগে পর্যন্ত ক্ষমতাধারী মানুষেরই জয়গান গাইতে অভ্যস্ত থেকেছে।

কিন্তু এই অবহেলিত শ্রেণির মানুষদেরকে 'সাবঅল্টার্ন স্টাডিস' এর মত আধুনিক তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করার আগে যিনি তাদের শোষিত কণ্ঠস্বরকে প্রতিবাদী করে কলম ধরলেন তিনি মহাশ্বেতা দেবী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বিশ্বাসে বলেছিলেন—

> "নবোদিত সাহিত্যসূর্যের আলোক প্রথমে অত্যচ্চ পর্বতশিখরের উপরেই পতিত হইয়াছিল, এখন ক্রমে নিম্নবর্তী উপত্যকার মধ্যে প্রসারিত হইয়া ক্ষুদ্র দরিদ্র কুটিরগুলিকেও প্রকাশমান করিয়া তুলিতেছে।"[১]

সেই বিশ্বাসকে মনেপ্রাণে সাহিত্যের মাধ্যমে মহাশ্বেতা দেবী বাস্তবায়িত করতে সফল হয়েছিলেন। তিনি আসলে শুধুমাত্র একজন লেখক ছিলেন না, ছিলেন সমাজকর্মীও। জীবনের একটা দীর্ঘ সময় তিনি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশের উপজাতি গোষ্ঠীর জন্য কাজ করেছেন, তাদের অধিকারের বিষয়ে সমাজকে সচেতন করার ব্রতে নিজেকে নিমগ্ন করেছেন। এই উপজাতিদের অধিকারের লক্ষ্যে কাজ করতে গিয়েই তিনি উপলব্ধি করেছেন গল্প-উপন্যাসকে কল্পনাশ্রয়ী রোমান্সের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, বরং সাহিত্যিকের কাজ তার থেকেও অনেক গহীন এবং গুরুতর—

> "লেখক হিসাবে, সমকালীন সামাজিক মানুষ হিসাবে, একজন বস্তুবাদী ঐতিহাসিকের সমস্ত দায়দায়িত্ব বহনে আমরা সর্বদাই অঙ্গীকারবদ্ধ।"[২]

লেখকের এই ইতিহাসচেতনা অন্ত্যজ মানুষদের শোষণ ও অত্যচার, বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের চেতনাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। প্রান্তিক মানুষদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার সূত্রে স্বাভাবিকভাবেই মহাশ্বেতা তাঁর রচনায় তুলে এনেছেন প্রান্তিক এবং অন্ত্যজ নারীদের শোষণ-যন্ত্রণা এবং অত্যাচারের কথা। কারণ একথা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়না যে যেখানে একটা সমগ্র শ্রেণি অন্ত্যজ বলে অবহেলিত ও নিপীড়িত সেখানে সেই সমাজের নারীরা কতটা বঞ্চনা ও অবমাননার শিকার হতে পারে। কিন্তু যেহেতু তিনি প্রান্তিক মানুষগুলোর সঙ্গে খুব কাছ থেকে মিশেছিলেন তাই তিনি দেখেছিলেন বাইরের তথাকথিত 'সভ্য' সমাজ আদিবাসী সমাজের অন্যতম অবলম্বন এই নারীদের নানাভাবে লাঞ্ছনা, বঞ্চনা এবং নিপীড়ন করলেও, নারীদেহের লোভে তাদের বারবার বিবস্ত্র করে সমাজে তাদের অবস্থানকে নিম্নমুখী করে তোলার চেষ্টা করলেও নারীরা মৌন ও নির্যাতিত হয়েই কাল কাটায়নি। অন্ত্যজ এই মানুষদের নিয়ে লেখা মহাশ্বেতা দেবীর অসংখ্য গল্পে এরকম নারীচরিত্রই কেন্দ্রীয় হয়ে উঠেছে যারা অত্যাচার-অবমাননা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করে সমাজে যেমন নিজেদের অবস্থানকে দৃঢ় করেছে, তেমনি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষমতাও অর্জন করেছে। এমনকি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছে, ব্যাপক আকারের বিদ্রোহে-বিপ্লবে তারা অনায়াসে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা অর্জন করেছে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মশাল হাতে তুলে নিতে পিছপা হয়নি। এই মানুষগুলির কথা স্মরণ করেই তাই মহাশ্বেতা বলেছেন—

> "... আমার লেখার কারণ ও অনুপ্রেরণা হল সেই মানুষগুলি যাদের পদদলিত করা হয় অথচ যারা হার মানেনা। আমার কাছে লেখার উপাদানের অফুরন্ত উৎসটি হল এই আশ্চর্য মহৎ ব্যক্তিরা, এই অত্যাচারিত মানুষগুলি।"[৩]

তাঁর 'রুদালী', 'টুং-কুড়', 'গহুমনি', 'শিকার', 'দ্রৌপদী', 'বাঁয়েন', 'ধৌলি' ইত্যাদি অনেক গল্পেই সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রান্তিক নারীর অধিকার অর্জনের লড়াইয়ের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে।

'রুদালী' গল্পে এক গঞ্জু নারীর রুদালী হয়ে ওঠার এক সম্পূর্ণ ইতিবৃত্তকে ব্যাখ্যা করেছেন লেখক। রুদালী বলতে বোঝায় রাজস্থানের একটি বিশেষ পেশা, যারা কেউ মারা গেলে কান্নার জন্য ভাড়া করা লোক হিসাবে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। শনিচরীর মত একজন গঞ্জু নারী, যে জন্ম থেকেই অবমাননা আর অবহেলা ছাড়া আর কিছু পায়নি সে-ই গঞ্জু এবং দুসাদদের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা রাজপুতদের মৃত্যুর পরে তাদের জন্য লোক দেখানো কান্নার পেশা গ্রহণ করে 'রুদালী' হয়ে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন অর্জন করেছে। শনিচরী জীবনে কখনোই সুখের মুখ দেখার সৌভাগ্য লাভ করেনি। সমাজের চোখে 'অপয়া' বলে পরিচিত হয়ে একে একে শাশুড়ি, স্বামী, ছেলেকে হারিয়ে রাজপুত রামাবতার সিং এর 'বেঠোবেগারী' করতে গিয়ে সে কোনদিন একবিন্দু কান্নার সময় পর্যন্ত পায়নি। যে

নাতিকে আশ্রয় করে সে বাঁচতে চেয়েছে সে পর্যন্ত তাকে ছেড়ে ম্যাজিশিয়ানদের দলে চলে গেছে, এমনকি তার একমাত্র ছেলের বউও পেটের দায়ে ঘর ছেড়ে পরিণত হয়েছে 'রাণ্ডী' তে। কিন্তু উচ্চবর্গের রামাবতার সিং এর মত মানুষদের কাছে বেগার খেটে নিজের সখ-আহ্লাদ পূরণ করতে অক্ষম হয়ে সে দুলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার আর এক সবহারানো বন্ধু বিখনির সঙ্গে মিলে এই অত্যচারী রাজপুতদের মৃত্যুর পরে লোকদেখানো কান্নার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের পথ তৈরি করেছে। তারা বেঁধে দিয়েছে কান্নার রেট—

"শুধু কাঁদলে একরকম রেট।
কেঁদে লুটোলে পাঁচ টাকা এক সিকে।
কেঁদে লুটিয়ে মাথা ঠুকলে পাঁচ টাকা দু সিকে।...”[৪]

আসলে ভৈরব সিং এর মত বহিরাগত অত্যচারী রাজপুতরা বেঁচে থেকে চিকিৎসা করিয়ে অর্থ ব্যয় করার থেকেও অনেক বেশি বিশ্বাস করে মৃত্যুর পরে লোকদেখানো কান্না ও ক্রিয়াকর্মের পিছনে অর্থ ব্যয় করাকে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই এই রাজপুতদের দ্বারা অত্যাচারিত ও অসম্মানিত শনিচরী নিজের চেষ্টায় রুদালী হয়ে উঠেছে, এমনকি বাজারের ভাড়া করা রাণ্ডীদেরও নিজের দলে নিয়ে আলাদা একটা দল তৈরি করে রান্ডীদের কাছে 'হুজুরাইন' বলে পরিচিত হয়ে নিজের পাশাপাশি বঞ্চিত দেহবেচা রাণ্ডীদেরও অর্থ উপার্জনের পথকে প্রস্তুত করে বুঝিয়ে দিয়েছে নারী চাইলে সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করে হলেও নিজের অর্থনৈতিক পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হতে পারে। এই অর্থনৈতিক ক্ষমতা লাভই সাধারণ নারী শনিচরীকে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে অনুমোদন জুগিয়েছে, সব হারানোর পরেও তার বাঁচার কারণ হয়ে উঠেছে।

আদিবাসী সমাজের ওপরে জোরপূর্বক আধিপত্য বিস্তারকারী উচ্চবিত্ত সমাজ যে শুধুমাত্র তাদের সর্বস্ব সম্পদ ও অধিকার হরণ করেছিল তা-ই নয় সেই সঙ্গে হরণ করেছিল আদিবাসী নারীর সতীত্ব। আদিবাসী সমাজে তথাকথিত আধুনিক সমাজের মত নারী-পুরুষের কাজে-কর্মে ভেদ হয়না। নারীরা পুরুষের সমকক্ষ হয়ে কাজ করার উপযোগী বলেই তাদের সমাজ মনে করে। কিন্তু আধুনিক শহুরে মানুষেরা এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপরে অধিকার বিস্তার করে তাদের সম্প্রদায়গত শক্তিহীনতাকে কাজে লাগিয়ে এই নারীদের নিজস্ব ভোগ্য পণ্য ভাবতে যে কুণ্ঠিত হয়না তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'টুং-কুড়' গল্পে—

"মণ্ডলরা এমন অনেক মেয়ে নষ্ট করেছে। তারা কেউ মরেছে আত্মঘাতী হয়ে, কেউ ভিখ মাঙতে বেরিয়েছে, কেউ জারজ ছেলেকে নিয়ে গ্রামেই থেকে গেছে।”[৫]

কিন্তু দুলে ঘরের মেয়ে আলতাদাসী টোকাই মণ্ডলের অত্যাচারে সামান্য ধানকুড়ানিতে রূপান্তরিত হলেও টোকাই মন্ডলের ছেলে গোপালের ভোগ্যপণ্য হয়ে সে মুখ বুজে থাকেনি, বরং সে যে গোপালের সন্তানেরই মা হচ্ছে একথা জানিয়ে সর্বসমক্ষে নিজের অধিকার দাবি করে তার সম্প্রদায়ের মেয়েদের ও পুরুষদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার শক্তি জুগিয়েছে। দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলায় টোকাই মণ্ডলের পরাক্রমতার কাছে জর্জরিত এই প্রান্তিক মানুষগুলো বুঝেছে চাইলেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করা যায়। তাই পুরুষরা একত্রিত হয়ে গোপালকে ধরে এনে তাকে তার অন্যায়ের স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করে বুঝিয়ে দিয়েছে আর চাইলেই বহিরাগত সমাজ তাদের নিপীড়িত করতে পারবে না। মেয়েরাও আলতাদাসীর প্রতিবাদের বলে বলীয়ান হয়ে তাদের বিরুদ্ধে হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে অগ্রসর হয়েছে। তারই ফলস্বরূপ প্রান্তিক কৃষিজীবী তেনয়নী জাত্যাভিমানী গড়াইগিন্নির কাছে গোপালের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে বলেছে—

"একশোবার অন্যায়। গোপাল মোড়লের অন্যায়। তোমাদের ঘরের ছেলেরা আমাদের ঘরের মেয়ে বউয়ের লালচে মরে সেটা অন্যায় হয়না?”[৬]

একজন অতিসাধারণ নারী আলতাদাসী অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মাধ্যমে একদিকে নিজেকে যেমন সমাজে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নিজের সামাজিক ক্ষমতায়নের পরিচয় দিয়েছে তেমনি বাকি নারীদেরকেও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে, পুরুষদের রাজনৈতিক অধিকারের বোধকে জাগ্রত করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হতে শিখিয়েছে।

আবার সমাজে নারীর এই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার বাস্তব চিত্র দেখা যায় 'গোহুমনি' গল্পে বিশাল ভুঁইয়ার বিধবা স্ত্রী ঝালোর মধ্যে। সমুন্দরের মত রাজপুত

মালিকরা তাদের ‘কামিয়া’ প্রথার সাহায্যে বেগার শ্রমিকে পরিণত করে দিলেও, এমনকি অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য বিশালকে অন্যত্র কাজ করতে বাধ্য করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলেও অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করেনি ঝালো। ‘ওদের জাতে মেয়েদের তো এত ইজ্জত থাকেনা’ একথা ভেবে জমি জরিপের তশীলদার ঝালোকে ভোগ করতে চাইলে সে রুখে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে—

> “পথের কুত্তীরও যদি কখনও ছুটি মিলে, তবু আমাদের মিলেনা। মালিকরা তো আমাদের বিনা পয়সার রেন্ডী করেই রেখেছে।”[৭]

তশীলদারের এই অন্যায়ের জন্য তাকে রীতিমতো কামড় দিয়ে সে যখন তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করে তখন যেমন তার সমাজের বাকি নারীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেষ্ট হয়ে ওঠে তেমনই সমুন্দরের মত রাজপুতরাও বুঝতে পারে তাদের অন্যায় জুলুমের দিন অস্তগত। এইভাবেই সমাজে নিজের ক্ষমতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে স্বামীর ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে সে হয়ে ওঠে গহুমনি অর্থাৎ গোখরো সাপ। এই গহুমনিদের চাইলেই আর সমাজ বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত করতে পারেনা।

নারীর সঙ্গে হওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকারের স্বরূপ মহাশ্বেতা দেবীর বিভিন্ন গল্পে বিভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তার আর একটি নিদর্শন ‘শিকার’ গল্পটি। মেরী ওঁরাও- এর মা সাহেবের জারজ সন্তান হিসেবে সমাজের চোখে হীন হয়ে তাকে জন্ম দিলেও মেরী এই অবমাননা নিজের ক্ষেত্রে মানতে নারাজ থেকেছে। কর্মঠ-শক্তসামর্থ্য এই মেয়েটি যেমন নিজের ভালোবাসার মানুষটিকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেখিয়েছে তেমনই কাজের ক্ষেত্রেও পুরুষের সমকক্ষ হওয়ার সাহসকে বাস্তবায়িত করেছে। সে আর পাঁচটা অন্ত্যজ নারীর মত দুঃখ- দুর্দশাপূর্ণ জীবন চায়নি। সে আত্মসম্মানের দ্বারা অধিষ্ঠিত হয়ে সমাজে বাঁচতে চেয়েছে বলেই তার প্রেমিক জালিম ভিন্ন অন্য যে-ই তার দিকে তাকিয়েছে তাকে তার যোগ্য অবস্থানটা বুঝিয়ে দিতে সে পিছপা হয়নি। তাই মালিকের কাঠ বিক্রির তশীলদার যখন তার দিকে কুনজরে তাকিয়ে তার ইজ্জতকে অসম্ভ্রমের চোখে দেখেছে তার ফলস্বরূপ আদিবাসী সমাজের নিয়ম অনুযায়ী হোলিতে নারী সেবারে যখন বন্য পশু শিকারের অধিকার লাভ করেছে সেই শিকারের দিন এই তশীলদারকেই তার শিকারের যোগ্য জানোয়ার বলে মনে হয়েছে—

> “আজ আর ছোট কিছুতে মন উঠবে না ওর। বড় শিকার চাই, বড় শিকার! মানুষ চাই, তশীলদার।”[৮]

যৌন লালসার তীব্র আবেগের মধ্যে তশীলদারকে বশীভূত করে তাকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে মেরী নারী শরীরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি প্রদানকারী হীন পাশবিক প্রবৃত্তির মানুষের পরিণতিকে চিহ্নিত করে দিয়েছে। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের দ্বারা নিজের সম্ভ্রম রক্ষার মাধ্যমে মেরী ওঁরাও সমাজে তার স্বাধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করে নারীর মর্যাদাকে যেভাবে উন্নীত করেছে তা তার সমাজের বাকি নারীদেরকে তাদের স্বাবলম্বন সম্পর্কে জানতে সচেষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে, একথা বলাই যায়।

আবার ‘সাঁঝ সকালের মা’ গল্পে অভিশপ্ত জরা ব্যাধের বংশধর এক নারীর নিজের সম্প্রদায়ের বাইরে বেরিয়ে কান্দোরী জাতির পুরুষকে বিবাহ করে অকালে স্বামীকে হারিয়ে একরত্তি সন্তানকে নিয়ে পুরুষের লালসা থেকে বাঁচার জন্য সমাজের চোখে ‘ঠাকুরাইন’ হয়ে ওঠার লড়াইয়ের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। বৈধব্যের অসহায়তায় সে একাধিক আশ্রয়ের সন্ধান করে বুঝেছিল নারী মাংসলোভীদের থেকে তার বাঁচার কোন উপায় নেই। তাই এক সন্ন্যাসীর কথায় সে গেরুয়া পরে জটি ঠাকুরানীর রূপ নিয়ে নিম্নবর্গ সম্প্রদায়ের মানুষ হয়েও সমাজে দেবাংশী বলে নিজেকে অধিষ্ঠিত করার লড়াইয়ে সফল হয়ে নিজের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সার্থক হয় এবং সমাজের মা হওয়ার পাশাপাশি নিজের সন্তানের মা হিসেবেও সার্থকতার সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করে। এক নিম্নবর্গ যাযাবর নারী হয়েও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় না থাকলে তার পক্ষে সমাজে নিজের অধিকারকে কায়েম করা সম্ভব হতনা। তার মৃত্যুকালে জটি ঠাকুরানী সম্পর্কে মানুষের অভিব্যক্তিকে চিত্রিত করেছেন লেখক—

> “সাধনের মাটির উঠোনে পাড়া-পড়শীর ভিড়। যেন এক অন্ত্যজ, গরিব, হতভাগিনী মারা যাচ্ছে না, যেন কোন মহামানী দামী মানুষ মারা যাচ্ছে তাই এত ভিড়।”[৯]

মহাশ্বেতা দেবীর সৃষ্ট প্রান্তিক নারীরা এভাবেই প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে সমাজে নিজের অধিকারকে কায়েম রাখার ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করেছে।

আবার প্রান্তিক নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের চিত্র মহাশ্বেতা দেবী অঙ্কন করেছেন 'দ্রৌপদী' গল্পে। প্রান্তিক জাতিবর্গের প্রতি অত্যচারের প্রতিনিধিস্বরূপ সূর্য সাহু এবং তার ছেলেকে হত্যার মূল কান্ডারী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের দোপ্দি মেঝেন এবং তার স্বামী দুলন মাঝি। শুধু তাই নয় তাদের ওপরে হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদে থানা আক্রমণ, বন্দুক অপহরণ, অত্যাচারী জমিদার-জোতদার-মহাজনদের হত্যার মূল কারণও হয়ে উঠেছিল দোপ্দি ও দুলন। একজন নারী হিসেবে কোন কাজেই পিছিয়ে না থেকে অপারেশন বাকুলিতে অসামান্য আত্মরক্ষার পদ্ধতি ব্যবহার করে নিজের লক্ষ্যে অটল থেকে সেনানয়কের চক্রান্তে প্রাণাধিক প্রিয় স্বামীর মৃত্যুর পরও জঙ্গলে নিজের নেতৃত্বে অধিকার আদায়ের কঠিন লড়াইতে সে পিছপা হয়নি। কিন্তু অমানুষিক পরিশ্রমের পরেও নিজের সম্প্রদায়ের সোমাই ও বুধনা নামক দুই ব্যক্তির চক্রান্তে সে সেনানায়কের কাছে ধরা পড়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে বারংবার নির্যাতিত হয়েও পিছু হটেনি। আপাত রাজনৈতিক লড়াইয়ের মাঠে সে সেনানায়কের কাছে পরাজিত হয়েছে, মহাভারতের দ্রৌপদীর মত ভরা সভায় নির্যাতিত হয়েছে একথা ঠিকই, কিন্তু সে তার চিরকালীন লড়াইয়ের প্রত্যয় রেখে গেছে সেনানয়কের বিরুদ্ধে ব্যতিক্রমী প্রতিবাদের মাধ্যমে। সেনানায়কের অদ্ভুত লালসা দ্রৌপদীকে নগ্ন করে দিলেও সে অপূর্ব সাহসে ভর করে নিজের নগ্নতাকে হাতিয়ার করে যেভাবে সেনানায়কের মত অত্যাচারী মানুষের মানসিক নগ্নতাকে উন্মোচিত করেছে তা বহু নারীর কাছে সংগ্রামের অনুপ্রেরণা হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে একথা বলাই বাহুল্য। মহাশ্বেতা দেবীর বর্ণনায় দ্রৌপদীর জ্বলন্ত প্রতিবাদের বাস্তবায়ন ঘটেছে—

> "দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।"[১০]

শুধু দৌপদীই নয় নারী শরীরের প্রাকৃতিক দুর্বলতাকে অতিক্রম করে প্রকাশ্য সমরে মুখোমুখি লড়াইয়ের দৃষ্টান্ত সেই সময়ে মোটেই বিরল ছিলনা। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসেও মহাশ্বেতা বিরসার উলগুলানের ডাককে সফল করার লড়াইয়ে সালী নামক নারী চরিত্রের মধ্যে এই সংগ্রামী অনুপ্রেরণাকে চিত্রিত করেছেন, যে এই লড়াইয়ে বিরসার অন্যতম সহচরী হয়ে উঠেছিল। এইভাবেই প্রান্তিক নারী নিজের দক্ষতায় সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজের অধিকার বিস্তারের যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল, তাই সেই সময়ের প্রশাসনও তাদের নারী বলে অবহেলা করতে সাহস পায়নি।

'বাঁয়েন' গল্পে সমাজের চোখে হীন ডোম সমাজের এক হতভাগ্য নারী চণ্ডী বাঁয়েনের জীবন সংগ্রামের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই গল্পে প্রাথমিকভাবে দেখা যায় মলিন্দরের মত মহকুমা লাশঘরে চাকরিরত, সমাজের চোখে সম্মানীয় এই মানুষের ভালোবাসায় মোড়া সংসারের গৃহিণী চন্ডী। ডোম সমাজের এই সবচেয়ে সুন্দরী নারী আবার ভগীরথের মত ফুটফুটে একটি সন্তানের মা-ও। কিন্তু চণ্ডীর এই সুখী দাম্পত্য সমাজ মেনে নিতে পারেনি, তাই বংশ পরম্পরায় ভাগাড়ের যে ডোমবৃত্তি চণ্ডী পালন করে আসছে তা সহ্য করতে না পেরে অচিরেই সন্দেহের বশবর্তী হয়ে ভগবানের দোহাই দিয়ে তাকে গ্রামের বাচ্ছাদের মৃত্যুর কারণ বলে চিহ্নিত করে, এমনকি এক সদ্যজাত সন্তানের মা হিসেবে ভাগাড়ে পুরুষালি কাজ করতে গিয়ে তার টনটনে দুধের ভার থেকে দুধ মৃত শিশুর শবদেহের পাশে পড়েছে বলে সে মৃত সন্তানের মা হতে ইচ্ছুক এমনটা দাগিয়ে দিয়ে সমাজ তাকে বাঁয়েনে পরিণত করেছে। যে মানুষটা একটা সুখী গৃহকোণ রচনা করতে নিমগ্ন হয়েছিল সেই মানুষটাকে একটা শ্রেণির কুসংস্কারাচ্ছন্নতা যখন সমাজ বহির্ভূত জীবে পরিণত করেছিল তখন সেই পরিণতির কথা স্মরণ করে তার স্বামী মলিন্দর ভেবেছে—

> "আঁধারের ডর খায়, অন্ধকারে থাকতে লারত তারেই বিধাতা বাঁয়েন করে ছাড়লো?"[১১]

সমাজের এই সংস্কারের বেড়াজাল যে শুধুমাত্র এক নারীর সংসারের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করেছিল তাই নয় সেই সঙ্গে সদ্য সন্তানের মা হওয়ার সুখও কেড়ে নিয়েছিল। তবে এই গল্প শুধু এক জরাগ্রস্ত- কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিম্নবর্গীয় সমাজের নেতিবাচকতাকে চিহ্নিত করেনা, পাশাপাশি এক নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ের নারীর সংগ্রামী মনোভাবকেও উন্মোচিত করে। এক ডোম সমাজের উত্তরাধিকারীর গর্বিত সত্তা চন্ডীর মধ্যে দেখা যায়, যে নিজের বংশের পুরুষের অভাবে পুরুষের উপযুক্ত যে শবদেহ সৎকারের পেশা তাকে গর্ব এবং সাহসের সঙ্গে নিজের পেশা বলে গ্রহণ করে—

> "ওর বংশে ভাই-কাকা-দাদা থাকলে বংশের পুরুষের কাজ করত, কিন্তু কেউ নেই। ওরা সেই আদিম যুগের শ্মশানে দাস, যখন হরিশ্চন্দ্র চাঁড়াল হয়েছিলেন তখন চণ্ডীদের পূর্বপুরুষ ওকে কাজ শিখিয়েছিল।"[১২]

সমাজের বিরোধীতাকে অগ্রাহ্য করে নিজের পূর্বপুরুষের পেশাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাহসিকতার পাশাপাশি কিছু অসামাজিক মানুষের নোংরা চক্রান্তের হাত থেকে ফাইভ-আপ লালগোলা মেলকে বাঁচানোর জন্য ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে আত্মাহুতির নির্ভীকতার দ্বারা চন্ডীর নিজের হারানো পরিচয় আবার ফিরিয়ে আনার দৃঢ়তা— এসবই এক নারীর আত্মপ্রত্যয়কেই চিহ্নিত করে। তাই এই গল্প শুধু কুসংস্কার ও নিপীড়নেই শেষ হয়না, সমগ্র নিম্নবর্গীয় নারী সমাজের শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার সুসংস্কারকেই প্রতিফলত করে। এই সংস্কারই যুগে যুগে প্রান্তিক নারীকে তার অধিকারের লড়াইতে অগ্রণী করতে সমর্থ হয়, সমাজের অন্যায় বর্বরতার সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রামে প্রয়াসী করে তোলে।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর রচনায় এরকম অসংখ্য লড়াকু নারীকে এনেছেন। এই আলোচনার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি অত্যাচার এবং নির্যাতনেই প্রান্তিক নারীর জীবনচক্র সম্পন্ন হয়নি, বরং সেখান থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে নিজের মত লড়াই করে নিজেদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দ্বারা তারা দেখিয়ে দিয়েছে ক্ষমতা লাভ করার যোগ্যতা, নিজেদের মত করে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা সবই তারা অর্জন করতে সক্ষম। তাই সমাজ তাদের প্রান্তিক করে রেখেছে বলে তারা অন্ধকারে মুখ লুকোয়নি, সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির সার্বিক ক্ষেত্রে সমস্ত পৃথিবীর কাছে তারা নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে সফলকাম হয়েছে। পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, নারী শরীরের বর্বরতার প্রতি প্রতিবাদের দ্বারা ক্ষমতাশালী শাসক গোষ্ঠীকে সচেতন করা থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক আধিপত্যলাভ সব কিছুই তারা নিজে হাতে করেছে। হেরে যাওয়া মানুষের মত না বেঁচে পাশ্চাত্যের ‘নারীবাদ তত্ত্ব’ বাস্তবায়িত হওয়ার অনেক আগে থেকেই তারা নিজেদের সমস্ত রকমের অধিকার আদায়ের যোগ্য করে নিজেদের ক্ষমতা লাভের অভীপ্সাকে যেভাবে সফল করে তুলতে সক্ষম হয়েছে তা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। যখন আইন-আদালত প্রান্তিক নারীর কথা ভাবেনি তখন তারা নিজেরা নিজেদের কথা ভেবেছে, সমগ্র প্রান্তিক সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্রতে অগ্রণী হয়েছে। আসলে এই অন্ত্যজ নারীরা বুঝেছিল—

> “… তাকে হতে হবে অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত; তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে সব ধরনের প্রতিক্রিয়াশীলতার সাথে লড়াইয়ের জন্যে। … তাকে মনে রাখতে হবে সে মানুষ, নারী নয়; নারী তার লৈঙ্গিক পরিচয় মাত্র; …”[১৩]

এই বোধ তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল বলেই সমাজের কাছে অপাংক্তেয় সম্প্রদায়ের নারী হয়েও তারা সকল ক্ষেত্রে নিজের সার্বিক ক্ষমতায়নের পরিচয় দিতে সমর্থ্য হয়েছিল। সূচনাতেই বলেছিলাম ক্ষমতা আসলে অধিকারের আধিপত্য। প্রান্তিক নারীরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে সেই অধিকারের লড়াই লড়েছে এবং সমাজের কাছে জিতে নিয়েছে তাদের প্রাপ্য সম্মান, প্রমাণ করেছে তারাও কিছুতে কম যায় না।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। পঞ্চভূত। সুর কোম্পানি, ১৩০৪, ১৪ নং, ডাফস্ট্রীট, পৃ: ৮১।
২. দেবী, মহাশ্বেতা। অরণ্যের অধিকার। করুণা প্রকাশনী, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, ১৪১৮, কলকাতা, ভূমিকা অংশ।
৩. দেবী, মহাশ্বেতা। মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র। দে’জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তক মেলা, কলকাতা, পৃ: ৯৪।
৪. দেবী, মহাশ্বেতা। রুদালী। দে’জ পাবলিশিং, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা, পৃ: ৩৪।
৫. তদেব, পৃ: ৬০।
৬. তদেব, পৃ: ৬৩।
৭. তদেব, পৃ: ১০৫।
৮. দেবী, মহাশ্বেতা। মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন। ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৩, নিউ দিল্লী, পৃ: ৫৭।
৯. তদেব, পৃ: ৬৭।
১০. তদেব, পৃ: ৩৯।
১১. দেবী, মহাশ্বেতা। মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প। প্রমা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৩৫১, ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা-১৭, পৃ: ১৮২।

১২. তদেব, পৃ: ১৮৭-১৮৮।
১৩. আজাদ, হুমায়ুন। নারী। আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, ঢাকা, পৃ: ৩৭১।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. আজাদ, হুমায়ুন। নারী। আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, ঢাকা।
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। পঞ্চভূত। সুর কোম্পানি, ১৩০৪, ১৪ নং, ডাফস্ট্রীট।
৩. দেবী, মহাশ্বেতা। অরণ্যের অধিকার। করুণা প্রকাশনী, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, ১৪১৮, কলকাতা।
৪. দেবী, মহাশ্বেতা। মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র। দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তক মেলা, কলকাতা।
৫. দেবী, মহাশ্বেতা। মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন। ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৩, নিউ দিল্লী।
৬. দেবী, মহাশ্বেতা। রুদালী। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, কলকাতা।